Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 10 –16
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কালের করাল গ্রাসে কল্লোলিনী স্রোতধারা : প্রেক্ষাপট মধ্যযুগের রাঢ় অঞ্চল

ড. আসিফ জামাল লস্কর
সহযোগী অধ্যাপক
মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা
ইমেইল : ashifzamal17@gmail.com

Keyword
রাঢ় অঞ্চল, নদনদী, ব্যবসা বাণিজ্য, মজে যাওয়া ও অর্থনীতি।

Abstract
এক অধুনা বিস্মৃত নগরীমালার রহস্যময় সমাধিভূমি হল রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, মুকুন্দরামের চন্ডী মঙ্গল, কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে এই অঞ্চলের জনপদ ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া জ্যোয়াও দ্য ব্যারেস, ভ্যান ডান ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্রে বিভিন্ন নদীর প্রবহমানতা ও নগর-বন্দর গুলির পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক বাংলায় আগত সিজার ফ্রেডারিক,বারনিয়ার,ত্যাভারনিয়ার, র‍্যালফ ফিচ ও বারবোসা প্রমুখ বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপকূলীয় অঞ্চলের অথনৈতিক প্রবহমানতা। ঐতিহাসিক কাল থেকেই এই অঞ্চলটি কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য রুক্ষভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি-খড়িকা অন্তর্হিত হয়ে নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি করেছে। তাই রাঢ় অঞ্চলের নদী প্রবাহ এবং তার পরিবর্তনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবাহমানতা গবেষণার একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়।

Discussion
নদীমাতৃক সভ্যতার সূত্র ধরে সুপ্রাচীন কাল থেকে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল বহু বর্ধিষ্ণু জনপদ। রাঢ় বঙ্গের নগরায়ণের সার্থক বাস্তবায়নের কারণ হল এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান। এই অঞ্চলের অসংখ্য নদনদীগুলি ছিল কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ অনুকূল। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল নানা প্রকৃতির মিশ্র শহর, যে শহরগুলির অর্থনৈতিক প্রবহমানতা বৈচিত্র্যের দাবিদার। নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই। নদীকে কেন্দ্র করেই সভ্যতার বিকাশ। মানুষের স্থায়ী বসবাসের সূত্রপাত নদীর ধারে। আদি অনন্তকাল ধরে নদ-নদীই রাঢ় বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা বানিজ্য, জনবসতি স্থাপন, সেচ ব্যবস্থার বিকাশের প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।[১] নদীর সঙ্গে তাই এ অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক নিবিড় ও আত্মিক। এক কথায় এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক,

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে নদীর ভূমিকা অসীম। তাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যই হলো মধ্যযুগের রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও নদীর উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক প্রবহমানতাকে সার্থক ভাবে উপস্থাপিত করা।

প্রাচীন জৈনসূত্রে রাঢ় দেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'আচারাঙ্গ সূত্রে' লাঢ় বা রাঢ়দেশকে বলা হয়েছে জনপথহীন বনভূমি। প্রাচীন কালে রাঢ়ের দুটি প্রধান বিভাগের নাম ছিল- বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে রাঢ় দেশের বর্ণনা পাওয়া যায় –

"গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসর সৌধমালাবতংসো
বাহ্যতুচ্চৈ স্তয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্ম দেশঃ।"

এখানে রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে গঙ্গাপ্লাবিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনার পার্বত্যভূমি ও গভীর অরণ্য, অন্যদিকে শস্যশ্যামলা বাংলার সমতলভূমি- এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল রাঢ়দেশ। রাঢ় দেশের অনেক নদনদীর বর্ণনা মধ্যযুগে পাওয়া গেলেও বর্তমানে সেই স্রোতধারা বিলীন হয়ে গেছে বা মজে গেছে। তার মধ্যে কয়েকটি নদীর বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

দ্বারকেশ্বর নদী –

দ্বারকেশ্বর দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম প্রধান নদ। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার আদ্রা শহর ও হুড়া গ্রামের মাঝে অবস্থিত একটি ঝিল থেকে উৎপন্ন হয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। কিছুদূরে রোক ও দুধভরিয়া নামে দুটি নালা এই নদে এসে মিলিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনার কাছে কুমাসি নদী দ্বারকেশ্বরে মিশেছে। বাঁকুড়া শহরের কাছে প্রতাপপুরে গন্ধেশ্বরী নদী দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপর দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে আরামবাগ মহকুমার কুমারগঞ্জে এটি হুগলি জেলায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কাছে শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বারকেশ্বর রূপনারায়ণ নামে প্রবাহিত হয়েছে।[২] দ্বারকেশ্বর সাধারণত একটি জলহীন নদী। এর তলদেশ বালুকাময়। তবে বর্ষাকালে দুই কূল ছাপিয়ে বন্যা হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও আরামবাগ শহর তিনটি এই নদীর তীরে অবস্থিত।

আসানসোলের গারুই ও নুনিয়া নদী –

গারুই নদীর পাড়ে অবস্থিত আসানসোল শহরের জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে এই নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নুনীয়া নদীর।[৩] দুটি নদীর সংস্কার দীর্ঘদিন না হওয়ার কারণে, কার্যত মজে যেতে বসেছে। গারুই এবং নুনিয়া নদী কিন্তু একই নয়। দুটি নদীর উৎপত্তিস্থল সালানপুর ব্লকে হলেও, দুটি নদী আলাদা আলাদা জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। দুটি নদী মিলিত হয়েছে ঘাঘরবুড়ি মন্দিরের কিছুটা আগে। তবে দুটি নদী সম্পূর্ণ আলাদা। এক কালে এই নদী ছিল বেগবতী। জল এখনও বয়, তবে নদীর চেহারা ধীরে ধীরে নোংরা নালায় রূপান্তরিত হয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের গাড়ুই আর নুনিয়া নদী। নদীর সেই পরিসর আর নেই। বদলে তার বুকে পড়ে আছে কংক্রিটের জিনিস, আবর্জনা, বর্জ্য। দীর্ঘদিন ধরে অযত্নের ফলে আজ নদীদ্বয়ের এমন দশা। এক সময়ের নদী যতটা বিস্তৃত ছিল, আজ সেটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে এবং মজে গিয়েছে। অবৈধ নির্মাণ হল এর প্রধান কারণ। নদীর দুই পাড় আস্তে আস্তে বুজিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ি, কারখানা। ফলে, নদীর চেহারা নালায় পরিণত হয়েছে। গাড়ুই, নুনিয়ার মতো রাঢ়ের অনেক নদীরই আজ এরকম করুণ অবস্থা।

মুণ্ডেশ্বরী নদী –

বর্ধমানের রায়না থানার বেগোর মুখ থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়েছে দামোদর। এক দিকে বয়ে গিয়েছে মুণ্ডেশ্বরী। অন্য দিকে দামোদরের প্রধান শাখা।[৪] ঠিক সেখানেই মুণ্ডেশ্বরীর বুকে প্রায় দুই-আড়াই কিমি জুড়ে ছড়িয়ে বালির পাহাড়।

সেই উত্থিত বালুচরেই আটকে যাচ্ছে জলস্রোত। নদ পুষ্ট থাকলেও সহোদরা নদী খানাকুল পর্যন্ত ক্ষীণতোয়া। আর তাতেই রুখাশুখা দুই তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমি। আলুর বীজ বোনার মরসুমে চাষিরা ভয়ানক জলকষ্টে ভুগছেন।

কানা দামোদর বা কৌশিকী নদী –

বহুবছর আগে কানা দামোদর মূল দামোদরেরই একটি শাখা হিসাবে বিবেচিত হত। বর্ধমানের জামালপুরের কাছে মূল দামোদর থেকে কানা দামোদর বেরিয়ে এসেছিল।[৫] তারপরে হুগলি হয়ে হাওড়ায় ঢোকে কানা দামোদর। পাঁচলায় এসে বাসুদেবপুরে রাজাপুর খালে মিশে যায়। রাজাপুর খাল আবার কানা দামোদরকে মিশিয়ে দেয় উলুবেড়িয়ায় হুগলি নদীতে। বর্তমানে মূল দামোদরের সঙ্গে কানা দামোদরের সরাসরি যোগ নেই। কারণ মূল দামোদর অনেকটা সরে যাওয়ায় ডিভিসি তৈরি করে ইডেন চ্যানেল।[৬] এই খালের মাধ্যমে ডিভিসির ছাড়া জল এসে কানা দামোদরে পড়ে। কানা দামোদরের ১৫ কিলোমিটার অংশ বর্ধমানে, ৪৫ কিলোমিটার অংশ হুগলিতে ও ২৯ কিলোমিটার অংশ আছে হাওড়ায়। তার মধ্যে তেলিহাটি থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার অংশ মজে গিয়েছে।

ফান ডেন ব্রোকের নকশায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর পূর্ববাহী হয়ে আম্বোনা (Ambona)-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল- কুঝাটি বা ওঝটি, গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, দেপুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসানহাটি, নারিকেলডাঙ্গ, বৈদ্যপুর ও গহরপুর।[৭] গহরপুরের পরেই বাঁকা দামোদর আশ্চর্যজনক ভাবে হারিয়ে গেল।

কিন্তু কানা নদী দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার নিকাশি বেহাল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ জায়গা বুজে সঙ্কীর্ণ নালার রূপ নিয়েছে। অনেক জায়গা আবার ভরেছে কচুরিপানায়। কোথাও বা নদীর একাংশ দখল করে গড়ে উঠেছে বাড়িঘর। ফলে, বাধা পাচ্ছে জলস্রোত। অতীতে এই কানা নদী দিয়ে নৌকা চলত। এলাকার ব্যবসায়ীরা নদীপথে মালপত্র আনা-নেওয়া করতেন। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে সংসার চালাতেন। নিত্য প্রয়োজনেও মানুষ নদীর জল ব্যবহার করতেন। কিন্তু নদীটি সংস্কারের অভাবে এখন মৃতপ্রায়।[৮]

বিশেষজ্ঞদের মতে কানা দামোদর হলো অতীতের কৌশিকী এবং যেটি ছিল দামোদরের মূল শাখা।বহিঃবাণিজ্য চলত এই নদী পথ ধরে। প্রায় ২০০ বছর আগে এক বন্যায় এই নদী গতিপথ পাল্টে হাওড়া জেলার থেকে ৮-১০ কিমি পশ্চিমে বইতে শুরু করে কানা দামোদর বা কৌশিকী। যার ফলে এই নদী ক্ষীণ স্রোতা হয়ে যায়। বর্তমানে শুধু উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি এলাকাতেই শুধু নিয়মিত জল দেখা যায় দামোদর এর এই শাখাতে। গতিপথ পাল্টে যাওয়ার কারণে কৌশিকী আস্তে আস্তে ক্ষীণ স্রোতা হয়ে যায়। জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মজে যাওয়া নদীর উপরেই লোকজন চাষবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে বাঁধ নির্মাণ করে বসত বাড়ি তৈরি হয়। এইভাবে নদীর অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়।[৯]

বাঁকা নদী –

বর্ধমান জেলারই গলসি থানার রামগোপালপুর গ্রামে কাছে একটি জলাশয় থেকে বাঁকা নদীর উৎপত্তি। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমের দামোদর থেকে বাঁকা নির্গত হয়েছে। ১০ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় বেহুলার যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "ভাসিয়া ভাসিয়া পাইলো বাঁকা দামোদর"।[১১] কথিত আছে, এই নদীর নাম ছিল বঙ্কেশ্বরী। অতীতে বঙ্কা নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই নদীর তীরে সাধনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে নাম অপভ্রংশ হয়ে হয় বাঁকা নদী। অনেকের মতে, এই নদীতে রয়েছে অসংখ্য বাঁক, তাই এর নাম বাঁকা নদী। বর্ধমান শহরকে কার্যত আড়াআড়ি ভাবে দুটি ভাগ করেছে বর্ধমান শহরের সঙ্গে নাড়ির

যোগ থাকা বাঁকা নদী। বাঁকার উৎপত্তি এবং মিলনস্থল দু'টিই বর্ধমান জেলায়। প্রবাহপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে বর্ধমান শহরে রয়েছে ৩৫ কিলোমিটার। এরপর মেমারি, মন্তেশ্বর, কালনা হয়ে পূর্বস্থলীতে প্রবেশ করেছে। সেখানে সমুদ্রগড়ের উত্তরে জালুইডাঙায় খড়ি নদীতে মিশেছে বাঁকা। খড়ি -বাঁকার মিলিত ধারা নন্দাইয়ের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।[১২]

বাস্তবে দেখা গিয়েছে গলসি থেকে বয়ে আসার পর বর্ধমান শহরের শুরুতে রথতলায় দামোদরের সঙ্গে বাঁকার যোগস্থাপন করা হয়েছে। দামোদরের জল পাস করার সুবিধার্থে ওই জায়গাতেই রয়েছে লকগেট। বর্ধমানের বাসিন্দারা বলেন, এই লকগেট তৈরি করে বাঁকার গতিপথ রোধ করার কারণেই এর উপনদীগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।[১৩] বাঁকা নদী শহর বর্ধমানের নিকাশের প্রধান মাধ্যম হলেও আবর্জনা কচুরিপানা আর দখলদারিতে তার অবস্থা খুবই খারাপ। রথতলা থেকেই দেখা যায় নানা এলাকার নালা এই নদীতে এসে মিশছে। শুধু তাই নয় নদীতে মরা কুকুর বিড়ালের দেহ, পলিথিন বস্তুত আবর্জনা এবং কচুরিপানায় বাঁকার জল পরিবহন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে গিয়েছে।[১৪] বর্তমানে বাঁকা কার্যত একটি মৃত নদীতে পরিনত হয়েছে।

ময়ূরী নদী –

উত্তর রাঢ়ের এক বিস্মৃত নদী হল ময়ূরী। 'বাংলাদেশের প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়, সেকালে ময়ূরাক্ষী নদীর একটি সখী নদী ছিল। কজঙ্গলের পর্বতসানু থেকে নিঃসৃত হয়ে নদীটি কর্ণসুবর্ণ নগরের কাছে ময়ূরাক্ষীর সাথে মিলিত হয়েছে। তারপর দুই সখী একসঙ্গে কিছুদূর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বর্তমানে ময়ূরী নদীর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে বেশীরভাগ অংশ মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এই নদীর নাম ছিল ময়ূরী, চলিত কথায় মৌরী নদী। গৌড়বঙ্গের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ময়ূরাক্ষী,মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে।'[১৫]

অনেক বদল হয়েছে ময়ূরাক্ষীর বর্তমানেও বদলাচ্ছে এর গতিপথ। গত কয়েক হাজার বছর ধরে এটি ক্রমাগত দক্ষিণে সরে আসছে। ১৭৭৪ সালে রেনেল সাহেব তাঁর ম্যাপে মোর নদীর(More river) যে গতিপথ দেখিয়েছেন তাতে ময়ূরাক্ষী কান্দি মহকুমার কাছ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে মহালন্দি গোকর্ণের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। তবে তখনও এটি গঙ্গায় পড়ত। কাশীমবাজারের দক্ষিণে গঙ্গার অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীখাতই ছিল তার মোহনা। ১৬ অর্থাৎ বিগত ২৪৪ বছরে নদীর প্রবাহের শেষ অংশ প্রায় ২৩ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে সরে এসেছে। ময়ূরাক্ষীর পরিত্যক্ত অতীতের গতিপথের একাংশ কখনও কানা ময়ূরাক্ষী নামে কখনও মোর নদী নামে পরিচিত।

তবু ময়ূরাক্ষী বর্তমানেও আছে এবং নিয়ত নিজের কায়াকল্পের ভাঙাগড়ার বিরামহীন খেলার মধ্যে আজও সে উত্তর রাঢ়ের প্রাণস্বরূপা। যেহেতু এই নদী ময়ূরাক্ষীর সমান্তরালে প্রবাহিত হত; অতএব মোটামুটি কর্ণসুবর্ণ থেকে উত্তরপশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে ময়ূরীর প্রাচীন প্রবাহপথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নদীটির দুইধারে গ্রামের রেখা বীরভূমের পাথুরে লাল মাটির দেশে হারিয়ে গেছে কর্ণসুবর্ণের উত্তর পশ্চিম রেখা বরাবর। এ তো গেল ময়ূরীর গোড়ার কথা। এবার মোরগ্রামের পর নদীটির অন্তিম প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। মোরগ্রাম থেকে ময়ূরী মোটামুটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করে কাছে মুরশিদাবাদে এসে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা এরপর কাছে আবার দুই প্রশাখায় ভেঙেছে। উভয় প্রশাখাই সাগরদীঘির কাছে জলাজমিতে হারিয়ে গেছে।[১৭]

কোপাই নদী –

ঝাড়খণ্ডে জামতারা জেলার খাজুড়ি গ্রামে উৎপত্তি হয়ে দুবরাজপুর, খয়রাশোল, ইলামবাজার, লাভপুর থানার ২৩০টি গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে কোপাই। উৎস থেকে প্রবাহিত হওয়ার পরেই নদীর পরিচিতি 'শাল' নামে। বোলপুরের বিনুরিয়া গ্রামের কাছে নদীর নাম বদলে হয়েছে কোপাই। কিন্তু কোপাই নামেই এই নদী পরিচিত। এই নদী বীরভূমের বৃহৎ অংশের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। নানা ঋতুতে এই নদীর নানা রূপ। বীরভূম জেলার উত্তরে বক্রেশ্বর ও দক্ষিণে অজয় নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে কোপাই। লাভপুর থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে পাথরঘাটা গ্রামের

কাছে বক্রেশ্বর নদীর সঙ্গে মিশেছে কোপাই।[১৮] এই নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ৪৩৬ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু নগর সভ্যতার থাবায় প্রকৃতির উপর নরম আলপনার এই খোয়াই আজ বিলুপ্তির পথে।

নানা কারণে কোপাই বারবার বক্রগতিতে প্রবাহিত হয়েছে। কোপাই-এর এই বক্রগতিই আবার সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছে। এই নদীর বাঁকগুলো অনেকটা হাঁসুলি আকৃতির। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাস এই বাঁককে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা এক অমরসৃষ্টি। কবির ভাষায়, 'এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।' হয়ত 'প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।' মানুষের সঙ্গে কোপাই-এর আত্মীয়তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

"রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে।"[১৯]

দু'ধারের চাষবাস, প্রকৃতিতেও কোপাই নির্ভরতা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকির ঘেঁষাঘেঁষি।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্করের প্রতিবেশিনী কোপাই আজ মুমূর্ষ, ক্রমেই শুকিয়ে আসছে নদীখাত। নদীর গতিপথে বহু জায়গায় স্থায়ী বালির চর জেগে উঠেছে। শান্ত কোপাই বর্ষায় বন্যা ডেকে আনে, এরফলে বালি জমে নদীবুক আরও অগভীর হয়ে পড়ে। নদীটির প্রতি অধিকাংশ মানুষের উপেক্ষা আর অনাগ্রহই এর হারিয়ে যাওয়ার কারণ। সবচেয়ে বড় বিপদ নদীর পাড়ে গজিয়ে ওঠা যথেচ্ছ ইটভাটা ও পাড় থেকে বালি লুঠ।' শুকনো নদী খাত থেকে বেআইনিভাবে বালি চুরি চক্র রমরমিয়ে চলছে। শুধুমাত্র বীরভূম জেলাতেই কোপাই নদীর উপর ২৮টি ইটভাটা তৈরি হয়েছে। এই ইটভাটাগুলির ময়লা, বর্জ্যের অংশবিশেষ নদীকে দূষিত করছে। শুধু তাই নয়, যেখানে সেখানে নদীবক্ষে বাঁধ দেওয়ার ফলে কোপাই তার চলার নিজস্ব ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে।

গন্ধেশ্বরী নদী –

বাঁকুড়া জেলায় ছোট-বড় বেশ কয়েকটি নদ-নদ রয়েছে। এগুলির মধ্যে জেলা শহর ঘেঁষে বয়ে যাওয়া গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর অন্যতম। বাঁকুড়ার মানুষ গন্ধেশ্বরীকে ছোট নদী বলেই চেনেন। জেলার পশ্চিম সীমানায় শালতোড়া থানার কুলুরবাঁধ এলাকা এ নদীর উৎসস্থল। মুরলু টিলার দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালের জল গড়িয়ে এসে এই কুলুর বাঁধে সঞ্চিত হয়। এই কুলুর বাঁধের নীচের দিকে জলের স্রোত নেমে আসে ঝর্নার মতো। সৃষ্টি হয় ছোট নালার। পাশাপাশি, যুক্ত হয় আরও অনেকগুলি বৃষ্টির জলধারা। এই স্রোতধারা ক্রমাগত শালতোড়া থানার দক্ষিণ দিকে বয়ে এসে শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম হয়ে দক্ষিণ ঢালে বয়ে ছাতনা, বাঁকুড়া ১ ও বাঁকুড়া ২ ব্লক ছুঁয়ে ওন্দার ভূতেশ্বর গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদে মিলিত হয়।[২১] এই জায়গাটিকে বলে দোমোহানির ঘাট। ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীপথ। এক সময় এই গন্ধেশ্বরী নদী ছিল স্রোতস্বিনী। ফলশ্রুতিতে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে শিউলিবনা, ধবন, গোগড়া, আগয়া, কাঁটাবনি, চামকড়া, দুলালকুঁড়ি প্রভৃতি সমৃদ্ধ গ্রামগুলি।

আধুনিক নগর জীবনের বিকাশ এবং এক শ্রেণির চেতনাহীন মানুষের নির্দয় আঘাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রবাহিত গন্ধেশ্বরীকে মেরে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।[২২] এক সময়ে বাঁকুড়া পুরসভা এই শহরের আবর্জনা ফেলা শুরু করে গন্ধেশ্বরী নদীর বুকে। শহরের গবাদি পশুর মৃতদেহ, বাজারের আবর্জনা, পচা মাছ, বাড়ি ভাঙা-সহ নদী তীরবর্তী হোটেল ও অন্য দোকানগুলির যাবতীয় বর্জ্য ও অব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রতিনিয়ত ফেলা হয় গন্ধেশ্বরীর বুকে। সতীঘাট এলাকায় নদীর বিস্তীর্ণ বুক জুড়ে চড়া পড়ে সৃষ্টি হয় কাশবন, খেলার মাঠ। আর নদী পরিণত হয় এক সংকীর্ণ নালায়।

দামোদর নদীর গতিপথ পরিবর্তন –

দামোদর তার নিম্নাংশে চিরকাল একই পথে বয়ে চলেনি। ১৬৬০ সালে প্রকাশিত ভ্যান ডেন ব্রোকের মানচিত্রে দেখা যায় দামোদর তখন জাহানাবাদের কাছে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। প্রথম শাখাটি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কালনার কাছে ভাগীরথীতে মিশত আর দ্বিতীয় শাখাটি বর্তমান মজা দামোদরের খাত ধরে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে হুগলি নদীতে পড়ত।[২৩] ১৭২৬ সালে ওলন্দাজ ভন লিনেন বাংলার নদীপথের এক মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। ওই মানচিত্রে দেখা যায় দামোদর তখন বর্ধমানের কাছে দু'টি ধারায় বিভক্ত হত— পূর্বমুখী শাখাটি আম্বোয়ার কাছে ভাগীরথীতে মিশত আর দক্ষিণমুখী শাখাটি পাত্রঘাটা মোহনা হয়ে তমলুকের পাশ দিয়ে বয়ে যেত। এই পথেই এখন দামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরীর জলস্রোত রূপনারায়ণের মোহনার দিকে বয়ে যায়।[২৪]

কিন্তু ১৭৮০ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় দামোদরের গতিপথ আমূল বদলে গিয়েছে। পূর্বমুখী শাখাটি মজে গিয়েছে এবং নতুন নাম হয়েছে বাঁকা। যে নদীটি এখন গলসীর কাছে লোয়া-গ্রামের মাঠ থেকে উৎপন্ন হয়ে পালসিট পর্যন্ত দামোদরের মূল স্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে এসেছে, তারপর কিছুদূর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে লক্ষ্মীপাড়ায় কুঁয়ে নদীর সঙ্গে মিশেছে এবং পরে সেই মিলিত ধারা মালতিপুরে ভাগীরথীতে পড়েছে। মনসামঙ্গলে বর্ণিত কাহিনি থেকে বোঝা যায়, সেই সময় দামোদরের পূর্বমুখী শাখাটি ছিল প্রধান বাণিজ্যপথ এবং এই পথেই বণিকেরা প্রথমে দামোদর পরে ভাগীরথী বেয়ে সাগরে যেত।[২৫] দামোদরের বদ্বীপ অঞ্চলে গত চার শতাব্দীতে নদীপথ বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে ঘটলেও মানুষের ভূমিকাও ছিল সুদুরপ্রসারী।

উপসংহার –

নদী বাঙলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালীর চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। নদীই বাঙলাকে শ্যামল করে তুলেছে। নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালী বণিককে 'সাতসমুদ্দুর, তের নদী পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদী বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরদিকে তাকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল। গত কয়েক শতাব্দীতে বাংলার নদী-মানচিত্র অনেক বদলে গিয়েছে। বদ্বীপ গঠনের নিয়মে এবং মানুষের নানা কাজের ফলে হারিয়ে গিয়েছে অনেক নদী। অতীতে বহমান বহু নদী এখন অবলুপ্ত অথবা বদ্ধ জলায় পরিণত। বাংলার রাঢ় অন্চল তার জলন্ত উদাহরণ।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর থেকে কৃষিজমির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শুরু হয় নদীর দু'পাড়ে বাঁধ নির্মাণ। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকেরা সেনা বাহিনীর দ্রুত যাতায়াতের জন্য রেলপথ নির্মাণ শুরু করেন। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল সড়ক পথের দৈর্ঘ্য। পরবর্তী কালে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নগরায়ন এবং লোভী মানুষের অপরিণামদর্শিতা। যার ফলশ্রুতিতে হারিয়ে গেছে মধ্যযুগের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের বহু নদীখাত।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৮৯-৯৯
২. রুদ্র, কল্যাণ, বাংলার নদীকথা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৬১-৬২
৩. ভট্টাচার্য, কপিল, বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, পুনঃমুদ্রণ এপিডিআর, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১-১৩৫
৪. ভট্টাচার্য, কপিল, নিখুঁত পরিকল্পনাই দামোদরকে বাঁচাতে পারে, ১৭ই অক্টোবর ২০১৮, বর্তমান পত্রিকা

৫. Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal, Trubner & Co, London, 1976, p. 209-210
৬. Sen, S. K. Drainage study of lower Damodar Valley, D. V. C. Publication, Calcutta, 1962, p. 65
৭. দাস, ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, শ্রী বসন্ত রঞ্জন রায় (সম্পা.), বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫-৫৯
৮. আবসার, নুরুল, আনন্দবাজার অনলাইন পত্রিকা জগৎবল্লভপুর, ১৪ মার্চ ২০১৭
৯. ঘোষ, টি. নিম্ন দামোদর অঞ্চল বারবার বন্যায় ভাসে কেনো, দৈনিক প্রতিবিধান, ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
১০. Rennell, James, Memoirs of a map of Hindustan, Indian publication 1978, p. 147-148
১১. দাস, ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫৯
১২. বসু, অশোক কুমার, পশ্চিমবঙ্গের নদনদী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০২, পৃ.১-৮০
১৩. পাল, সুদীপ, প্রতিদিন চুরি যাচ্ছে ইতিহাসের বাঁকা নদী অতীতের বঙ্কেশ্বরী, বর্ধমান, নিউজ ফ্রন্ট, ২৯ শে জুলাই, ২০১৯
১৪. বল, আরোহন, বাকা একটি নদীর নাম, ১লা অগাস্ট, ২০১৮, বঙ্গদর্শন পত্রিকা
১৫. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, পৃ. ৭৮৭-৭৮৮
১৬. বন্দোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, বাংলার নদনদী, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯-৩৭
১৭. সরকার, সুপ্রতিম, নদীতে মিশেছে নয়নের জল, আনন্দবাজার অনলাইন পত্রিকা, ২৪শে জুন, ২০১৬
১৮. Rudra, Kalyan, Quaternary History of the Lower Ganga Distributaries, Geographical Review of India, Vol. 49, No. 3, 1987, p. 38-48
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কোপাই, ১লা ভাদ্র, ১৩৩৯, বঙ্গাব্দ
২০. তদেব
২১. বন্দোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-২২৮
২২. ভট্টাচার্য, সন্তোষ, গন্ধেশ্বরী: একটি নদীর অপমৃত্যু, লেখক সাংবাদিক ও গন্ধেশ্বরী নদী বাঁচাও কমিটির যুগ্ম সম্পাদক, ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
২৩. বসু, অশোক কুমার, গঙ্গা পথের ইতিকথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৮৮৯, পৃ. ৩৫-৩৬
২৪. Mukherjee, R. K. The Changing Face of Bengal, Calcutta university, Calcutta, 1938, p. 161-190
২৫. James, Fergusson, On the Recent Changes in the Delta of Ganges. Reprinted in Rivers of Bengal, Vol. I, West Bengal Gazetteers Department. Calcutta,1930, p. 183-227